

Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা কবিতার ঐতিহ্য : প্রাক-আধুনিক যুগ

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাইদুর রহমান ভুইয়া
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.3
Pages	55-69
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা কবিতার ঐতিহ্য : প্রাক্-আধুনিক যুগ

সাইদুর রহমান ভুঁইয়া

আধুনিক কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলা গদ্যের মতো বাংলা কবিতা একান্তভাবে কেবল আধুনিক যুগেরই অবদান নয়। বাংলা কবিতার একান্ত নিজস্ব একটা সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস বাংলার মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতায় স্বতঃস্ফূর্ত এবং একটা মৌলিক কাব্য-জিজ্ঞাসা নিয়েই তার শুভ-সূচনা হয়েছিল। জন্ম-সূত্রেই বাংলা কবিতা একটা গৌরবময় ভাব-সম্পদের অধিকারী ছিল এবং অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর পর্যন্ত ভাষাভঙ্গিসহ তার একটা ক্রমবিবর্ধিত উৎকর্ষমূলক লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য অনির্দেশ্য নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্দ্ধের প্রথম দশকে স্বাধীনতার বিনিময়ে অর্জিত ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনে আরোপিত কৃত্রিম আধুনিকতায় বাংলা কবিতার সেই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ঐতিহ্য-বিচ্যুত বিকারে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হলেও বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিক্ষেপ ও অভিজ্ঞতায় স্বীয় ঐতিহ্যে বাংলা কবিতার গৌরবিত প্রত্যাবর্তন ও মহত্তম মুক্তি যেমন বিস্ময়কর, তেমন তাৎপর্যপূর্ণ এবং কৌতূ-হলোদ্দীপক ভাবে অভিনিবেশযোগ্য।

ভাষাবিদ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট ৪৭টি পদ বাংলা কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে স্বীকৃত।[১] এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত পদ ক'টিই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বাংলা কবিতার প্রাথমিক অভিজ্ঞান। পদগুলো বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের ধর্মচিন্তা ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে লিখিত সঙ্গীতাশ্রয়ী কবিতা। বাংলা কাব্যসাহিত্যে এগুলো চর্যাপদ, চর্যাগীতিকা ও মরমী সঙ্গীতরূপে বিশেষভাবে পরিচিত। স্মর্তব্য যে, গীতিকাগুলো রাজকীয় প্রভাব-প্রশাসনের বাইরে গ্রাম-বাংলার মুক্ত পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় বৌদ্ধ-শ্রমণ কবি কর্তৃক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিকল্পিত ও রচিত।

সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় তত্ত্বের ব্যঞ্জনা গীতিকাগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও অনুভূতির স্বাভাবিক হৃদ্যতায় চিত্তবিনোদী রসাস্বাদে সুখপাঠ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট চর্যাগুলো সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন সিদ্ধাদের দ্বারা রচিত বিধায় তত্ত্ব ও সাধন মার্গের রূপগত কিছু পার্থক্য যেমন লক্ষিত হয়, তদ্রুপ দৃষ্টিভঙ্গি, মনোগতভাব এবং তার নিবেদনের ভঙ্গিতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কোন কোন চর্যায় জটিল রূপকালঙ্কারের সাহায্যে কেবল তত্ত্বব্যাখ্যা ও যোগমার্গের উপায় নির্দেশের প্রয়াস আছে, আবার কোন কোন চর্যায় তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও সিদ্ধির উপায় অপেক্ষা প্রেম, সৌন্দর্যানুভূতি ও ভাবাবেগের ব্যঞ্জনা প্রবল মনে হয়। শেষোক্ত চর্যাগুলো উপস্থিত আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য।

বাংলা ভাষা ও বাংলা কবিতার প্রাথমিক নিদর্শন হিসেবে এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের যোগাচারের গূঢ় তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ ও সাধন-ভজনের পদ্ধতি নির্দেশনার দিক থেকে প্রতীক রূপকাদি অলঙ্কারে ভূষিত নির্দিষ্ট গীতিকাগুলোর গুরুত্ব সন্দেহাতীত। কাব্যমূল্যের তুলনায় এগুলোর প্রাচীনত্ব, ভাষা, তত্ত্বগত রূপকার্থ ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিস্তর তথ্যবহুল আলোচনা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কিন্তু গীতিকাগুলোতে তদতিরিক্ত এমন কিছু অসাধারণ পুরোলক্ষণ আছে যেগুলো বাংলা কবিতার ঐতিহ্যিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে এবং তা হলো শ্রমণ-কবিদের কবিত্ব ও কাব্য-ভাবনা। এতদসম্পর্কে কোন নিষ্ঠ-সমীক্ষণ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের জীবন-দর্শনে সমস্ত-জগতই মানবচিত্তের অবিদ্যারূপ মায়ার সৃষ্টি তথা চিত্তের ভ্রান্তি স্বরূপ। তাঁদের মতে জগত সংসারের স্বতন্ত্র কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই, সবটাই মোহ-বদ্ধ চিত্তের সত্বরজস্তোমময়ী প্রকৃতির মায়া-প্রপঞ্চ।[২] ইন্দ্রিয়াদি পঞ্চভূত প্রভাবিত মায়া মোহময় জগত-সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ আসক্তিহীন, অবিমিশ্র নির্মোহ ধ্যানে আদি-অন্তবিহীন, দোষগুণ-রহিত, ভাবাভাব-মুক্ত শূন্যতা তথা নৈরাত্মরূপী সহজবোধে চিত্তের সংসিদ্ধ সংজ্ঞানই সিদ্ধাসাধনার সর্বশূন্যবোধ তথা পরমতত্ত্ব। চিত্তের এ সর্বশূন্য অবস্থাকে সহজিয়া সিদ্ধারা 'সর্বশূন্যরূপী নৈরাত্ম নৈরামনী বালিকা' তথা 'সহজ

সুন্দরী' সংজ্ঞানে কর্ণে কুণ্ডল পরনোর কথা বলেছেন। সহজ স্বভাবের এ পরমতত্ত্বে জগতের সমস্ত বস্তু বা জ্ঞানই সহজ বস্তু বা সহজ জ্ঞান। সিদ্ধাচার্য সরহপা' চিত্তের এ সহজভাবকে কল্যাণকারিণী বলেছেন এবং 'করুণা'র সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করেছেন। চিত্তের এ সহজ স্বভাব অবস্থায় সরহপা আনন্দ, নৃত্যগান, ভাববিলাস করতে বলেছেন এবং তিনি জীবনকে অস্বীকার করেননি।[৩] এ হলো চর্যাপদের পদের তত্ত্ব-সংক্ষেপ।

সিদ্ধা সাধনার উল্লিখিত তত্ত্ব বিশ্লেষণ থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা শূন্যতা বা নৈরাত্মবোধ তথা সর্বশূন্যতার যোগ সাধনায় যেখানে সমস্ত জগতকেই মায়ারূপে কল্পনা করে তার মোহজাল থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ পঞ্চভূত তথা ইন্দ্রিয়াদির উর্ধ্বে উঠার যোগ-মার্গ নির্দেশ করেছেন, সেখানে 'সর্বশূন্যরূপী নৈরাত্ম নৈরামনী বালিকা' তথা 'সহজ সুন্দরী'র প্রতিরূপে এ মায়াময় জগত সংসারের মধ্যমণি 'লীলাকমল'-রূপ মায়াবতী নারীকেই আবার তাঁদের সাধনার লীলা-সঙ্গিনীরূপে আরাধনীয় বিবেচনা করেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত চর্যাগীতিকার চরণ ক'টি লক্ষণীয়:

১ উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গ পিচ্ছ পরিহান সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী॥

২ উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহোরী নিঅ ঘরিনী নামে সহজ সুন্দরী॥

৩ নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ ছিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডল বজ্রধারী॥
... ...
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কৈ সে॥[৪]

উক্ত তত্ত্বনিষ্ঠ পঙ্‌ক্তিগুলোর রূপক ব্যঞ্জনায় নিসর্গ রূপারোপের বর্ণাঢ্য অঙ্গরাগ এবং মানবীয় প্রেমাবেশের কৌতূহলোদ্দীপক অনুভব তথা ভিন্ন স্বাদের চিত্তরঞ্জিনী রসানুভূতির রমণীয় কাব্যিক বৈলক্ষণ্য অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে, সুউচ্চ পর্বতবাসিনী, কণ্ঠে গুঞ্জার মাল্যভূষিতা,

কর্ণমূলে বজ্রকুণ্ডল শোভিতা, ময়ূরপুচ্ছ পরিহিতা, পুষ্পিত বিজন নিসর্গলোক–বিহারিণী নিঃসঙ্গ শবরী বালিকা সহজিয়া নিঃশ্রেয়স সাধনার অভিলষিত মানসকন্যা-রূপে সুগীত। এতদপ্রসঙ্গে নিম্নোক্ত চরণ ক'টিও দ্রষ্টব্য—

১ তীণি ভুবন মই বাহিঅ হেলে।
... ...॥

২ কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরি ভাভরি আলী।
অন্তে কুলিনজন মাঝেঁ কাবালী॥

৩ তইঁলো ডোম্বী সঅল বিটালিউ।
কাজণ কারণ সসহর টালিউ॥

৪ কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ণ মেলই॥[৫]

উদ্ধৃত পদগুলোর বিশদার্থে এ ধারণা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, চঞ্চলা, স্বেচ্ছাবিহারিণী লীলা লাস্যময়ী তথা কলাবতী নায়িকা ডোমনী, যোগিনী কিংবা শবরী মানসকন্যারূপে কেবল ইপ্সিতই নয়, সিদ্ধাদের মোক্ষ-স্বরূপ আনন্দলোকের সহজ লীলাসঙ্গিনীও বটে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে উল্লিখিত সিদ্ধাই পরমার্থতত্ত্বের 'সহজ স্বভাব' আসলে মায়ামোহরূপ চিত্তবৃত্তি বিমুক্ত বিমল চিত্তের নিরবয়ব মোক্ষপদানন্দময় চিত্ত-স্বরূপের মানবলোক, নিসর্গলোক-ভাবলোক বিহারিণী 'সহজ-সুন্দরী' রূপে এক রহস্যময়ী প্রমোদবালা। চর্যাগীতিকায় এ সর্বশূন্য তথা পরমার্থক লীলা-বৈচিত্র্য কখনো কখনো বাঙালী শ্রমণ কবির স্বভাবজ প্রেম, সৌন্দর্যবোধ ও নিসর্গপ্রিয়তার আশ্লেষে এবং একান্ত ভাবাত্মক অনুভূতির বিমূর্ত অনুরাগের অভাবিত শিহরণে কোন কোন চর্যা বা চর্যাংশের চিত্তাকর্ষক অনুরঞ্জন মর্মস্পর্শী। উদ্ধৃত চর্যাংশে এর উপস্থিত প্রমাণ অধ্যয়নযোগ্য। তত্ত্বজটিল চর্যাগীতিকায় নিহিত শ্রমণ-কবির এ অস্পষ্ট ভাবপ্রবণ অনুভূতিই বাংলা কবিতার মৌলিক উপকরণ। সিদ্ধা শ্রমণ কবির এ-মরমী ভাবালুতা বাংলার কোমল, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময় মাটি ও প্রকৃতির স্বভাবসূত্রে প্রাপ্ত আত্মগত উত্তরাধিকার।

উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের নিরিখে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে সপ্তম থেকে দশম শতকের নিশ্চিত রচনা-সাপেক্ষে নির্দিষ্ট চর্যাগুলো বাঙালী শ্রমণ-কবির মরমী ও ভাবালু মানসিকতায় মিশ্রিত প্রথম সঙ্গীতাশ্রয়ী লিখিত কাব্য-রূপ। চর্যাগীতিকার এ ভাবপ্রবণ মরমিয়া উত্তরাধিকার বিভিন্ন যুগে পর্যায়-ক্রমিক বিবর্তনে কিভাবে বাংলা কবিতার ঋদ্ধিমান ঐতিহ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, অতঃপর তাই দ্রষ্টব্য।

১২০২ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে মুসলিম রাজকীয় শাসনাধিকার সূচিত হয়।[৬] এ সময় থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মুসলিম শাসন অবসানের অব্যবহিত পরবর্তী ১৮০০ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয়শত বৎসর ইতিহাস রচয়িতা কর্তৃক বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যযুগ হিসেবে নির্দেশিত। প্রাচীন কাল থেকেই দেবভাষা সংস্কৃত ব্যতীত অন্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতজনের ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রতি উচ্চবর্ণ সমাজের বৈরিতা খ্যাত। সেন রাজবংশ তার ব্যতিক্রম ছিলো না।[৭] অপর দিকে সেন-শাসনামলে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার প্রাদুর্ভাব-খ্যাতিও বিদিত। এ সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতিকা-গুলোকে বেঁচে থাকার একান্ত আকাঙ্ক্ষায় তিব্বতের রাজপাঠাগারে আশ্রয় গ্রহণ এবং সুদীর্ঘ একশত বৎসর বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার অপ্রতুলতা সেন-শাসনাধীন বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রতিকূলতাকেই নিশ্চিত করে।

মধ্যযুগের শুরু থেকে প্রথম আড়াই শত বৎসরেও বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার কোন প্রমাণ নেই।[৮] কৌতূহলজনকভাবেই লক্ষণীয়, এক শ্রেণীর আধুনিক ইতিবৃত্তকার এ সময়টাকে বাংলা সাহিত্যের 'শূন্যতার ইতিহাস'[৯] বলে প্রমাণ করতে বড়বেশী উচ্চকণ্ঠ, অথচ সেন যুগের একশত বৎসর বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার অনুপস্থিতি সম্পর্কে লক্ষণীয়ভাবে নীরব। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন জাতি বা দেশ কর্তৃক অপর জাতি বা দেশ অধিকার এবং এভাবে রাজত্ব পরিবর্ধন ও অবস্থানান্তরের ধারায় ধর্মীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি পরিবেশের কারণে বিজিত রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা-সমঝোতা ও শাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান এবং স্থিতি-স্থাপনে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়াটা ইতিহাসগত স্বাভাবিক

ঘটনা বলে স্বীকৃত। তদপুরি বাংলাদেশে বিজিত ও বিজেতাদের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি, মানসিকতা ও জীবন দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সম্পূর্ণ বৈর-ভাবাপন্ন। এরূপ ব্যাপক বৈরী রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্রান্তিপর্যায় কেবল বাংলাদেশে কেন, কোন দেশেই সৃজনশীল সাহিত্য-কর্মের অনুকূল নয়। এতদ্ব্যতীত, যে স্থলে একটা স্ফুটনোন্মুখ সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসকে অঙ্কুরেই নিরুদ্ধ করা হয়েছে এবং সুদীর্ঘ এক শতাব্দী পর্যন্ত যে প্রয়াস অবরুদ্ধ ছিলো, অনুকূল পরিবেশেও স্বভাবতই তার পুনরুজ্জীবন সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার।

মুসলিম অধিকারের প্রথম দু'শত বৎসর বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার সহায়ক না হলেও সাহিত্য চর্চায় উচ্চবর্ণ সমাজের দেবভাষা কেবল সংস্কৃতের প্রাচীন একাধিকার থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যে মাতৃ-ভাষা বাংলায় প্রত্যাবর্তন তথা মুক্তি এককভাবে মুসলিম আধিপত্যেরই অবিস্মরণীয় প্রাথমিক অবদান। অতঃপর দীর্ঘ চারশত বৎসর (১৫০০-১৮০০) ব্যাপী বাংলা ভাষা ও বাংলা কাব্যের মহিমান্বিত ও বহুমুখী ঐতিহ্যিক ক্রমবিকাশে এবং ভাষাভিত্তিক একক জাতিত্ব-চেতনার উন্মেষে বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার ও তার প্রভাব এক সুদূরগামী মাহাত্ম্যের মূল্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।[১০] বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও জাতিত্বের যে গৌরব আমরা অনুভব করি, বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে তা আজ দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হ'ত। সেহেতু বাংলাদেশে মুসলিম অধিকার ও তার প্রভাবের যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব নিরূপণ ব্যতীত বাংলাভাষা ও বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যিক ক্রমবিকাশ ও উত্তরাধিকারের যে কোন পর্যালোচনা ঐতিহাসিক মূল্য-বোধ বিচ্যুত গুটেষা মানসিকতার পরিচায়ক বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

মধ্যযুগে বিশ্বের সর্বত্রই মানব সমাজের প্রধানতম নিয়ামক ছিলো ধর্ম এবং জাতিসত্তার একমাত্র অভিজ্ঞান। অপরাপর দেশের তুলনায় প্রাচীন কাল থেকেই স্থানীয় ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের জাতি-উপজাতি-প্রজাতির মিশ্রণে বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের ধর্ম ও সমাজজীবনে এক অপরিবর্তনীয় জটিল ও সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থা বিদ্যমান ছিলো।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে এদেশের আদিম অধিবাসী অনার্য সমাজ এবং প্রাচীন বহিরাগত বর্ণধর্মী সম্প্রদায় বিশ্বাসে সনাতন পৌত্তলিক হলেও কুলীন-অকুলীন ভেদে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তির পার্থক্যে ও বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য-বৈসাম্যে অসম্বন্ধ ও বিভক্ত ছিলো এবং বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের জাতি-উপজাতিসমূহ অঞ্চল ভিত্তিক নিজস্ব ভূস্বামীর অধীন নিজ নিজ দেব-দেবী অনুশাসিত ধর্ম-কর্ম, সংস্কার-সংস্কৃতি নিয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতো। অপর-দিকে নবীন বহিরাগত মুসলিম জাতি সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাতেই কেবল সম্পদশালী ছিলো না, ধর্মবিশ্বাস তথা জীবন-দর্শনেও তারা অনাদ্যন্ত কালের নিরাকৃতি একক শক্তিতে বিশ্বাসী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ অভিন্নাত্মক মানবীয় কল্যাণবোধে উদ্দীপিত ছিলো। জগত-জীবন-ধর্ম ও মানব সম্পর্কের এ পরস্পর-বিরোধী কঠিনতম ও বিবিধ মৌলিক বৈপরীত্যে নবাগত মুসলিম শক্তির একক ও দৃঢ় প্রশাসনিক কাঠামোর অধীন নিরাপদ ও স্থিতিশীল বৃহৎ বাংলাদেশ সংগঠনে সময় লেগেছিল প্রায় দু'শত বৎসর। এ দীর্ঘকাল যাবত বস্তুনিষ্ঠ ও গতিশীল মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির মানবীয় জীবন-বেদের সঙ্গে নিরন্তর সংযোগ সংঘর্ষে বাংলাদেশের আদিম, বর্ণবাদে নির্জ্জিত, স্থির ও বিসদৃশ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ এক নতুন জীবনধর্মী গতিময়তায় তৎপর হয়ে উঠে এবং মানব-সম্পর্কের লৌকিক তাৎপর্যে রক্ষণশীল ধর্ম-কর্ম সমাজ-সংস্কৃতির সংঘাত সংমিশ্রণ, সমন্বয় ও উত্তরণ প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বিশেষ করে বৃহত্তর লোক-জীবনে এক নব চেতনার জাগরণ সূচিত হয়। এ নবতর চেতনায় জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, সমস্ত আয়োজন, আনন্দ-বিলাস পূর্বের মত কেবল দেবলোকেরই নৈবেদ্য নয়, একটা ইহলৌকিক স্বতন্ত্র মূল্যবোধে, একটা মানবীয় মাহাত্ম্যের উপযোগিতায় জীবন এখন অনুভাবিত, উদ্দীপিত। দেবতা বা দেবতুল্য মানবের প্রয়োজনে নয়, জীবনের প্রয়োজনেই জীবন এখন অনেক বেশী মূল্যবান, অনেক বেশী কাম্য। এখন মানবসম্পর্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং একান্ত কাঙ্ক্ষিত হৃদয় সংবেদ তার প্রেম, তার মমত্ববোধ তথা মানবত্ব। এতকাল এ মহত্তম অনুভূতি ছিলো স্বর্গ-লোকের দেব-দেবী কিম্বা ঊর্ধ্বলোকচারী দেবসদৃশ মানব-মানবীর

একাধিকারভুক্ত। দেব ভাষায় রচিত পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য ছিলো তার একক দখলীকৃত স্বত্বাধিকার,—নরলোকে মানুষের ভাষায় নরলীলা ছিলো পরিত্যাজ্য ও প্রত্যাখ্যাত। মধ্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এ অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রথম স্পর্ধিত অভ্যুত্থান। গবেষকদের বিচারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষার্দ্ধ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত।[১১] এ নির্ধারণায় চর্যাগীতিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্য রচনার অনুমিত ব্যবধান কিঞ্চিৎ অধিক চারশত বৎসর। এত দীর্ঘকালের উল্লিখিত পরিবর্তিত ব্যবধান অন্তে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাবগত ও রূপগত পার্থক্য স্বাভাবিক। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই প্রথম কাব্য যেখানে স্বর্গলোকের অন্যতম দেবতা মর্ত্যলোকের উচ্চবর্ণের মানব সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে অবতার বলে পরিচয় দিয়ে নিম্নবর্ণের গোপবধূর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের মানবলীলায় মত্ত। স্মর্তব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের পৌনপুনিক উল্লেখ থাকলেও রাধারূপে লক্ষ্মীর অবতারত্বের উল্লেখ নেই[১২] এবং লক্ষ্মীর প্রতিরূপে রাধার স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য কৌতূহলোদ্দীপক ও রহস্যময়। এ কাব্যে শ্রীরাধা একান্তই নরলোকে নিম্নবর্ণের গোপবধূ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দেবতা ও মানুষীর লৌকিক আখ্যানকাব্য। বৌদ্ধযুগের অতীন্দ্রিয় মরমী ভাবৈশ্বর্যের আপাত ঐতিহ্য-বিচ্যুতি লক্ষিত হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মানব-মুখিতা তথা মানবিক দিগ্-নির্দেশনায় বাংলা কাব্যের এক অবিস্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ উপযোজন। অতএব, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য হিসেবেই কেবল নয়, দেব-লোকলীলা ও দেবভাষার একক সাহিত্যিক স্বত্বাধিকার উল্লঙ্ঘিত মানবহৃদয়-সং-বেদের প্রথম লৌকিক ভাষ্যরূপে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মানুষের এ গৌরবিত আবির্ভাবের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

অতঃপর মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-প্রসঙ্গ মানুষ,—মানুষের জীবন তথা মনুষ্য সমাজ। চর্যাপদে মানুষের সমস্যা, অভাব-অনটনের কথা আছে, কিন্তু সবই নিগূঢ় তত্ত্বব্যাখ্যার প্রতীকে উক্ত, জীবনের প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে নয়। মধ্যযুগেই মানুষ প্রথম তার মর্ত্যজীবন,—মর্ত্যজীবনের কঠিন অস্তিত্ব, অস্তিত্বের স্বরূপ, তার ধর্ম-কর্ম, সমাজ-সমস্যা, জীবন-সত্য

নিয়ে কাব্যের তথা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ মূল্যে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রায় সমকাল থেকেই সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, বৈষ্ণব গীতিকা ও লোকসাহিত্যে মানব-প্রসঙ্গের প্রাধান্য সমধিক দৃষ্টিযোগ্য।

সূফী সাধকগণ কর্তৃক সম্প্রচারিত অভিন্ন মানবীয় সৌভ্রাতৃত্বের একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রসারে শঙ্কিত এদেশের বহুধাবিভক্ত আদিম ও প্রাচীন বহিরাগত দেবোপাসক সম্প্রদায়গুলোকে দেবানুসৃত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিতে উদ্দীপিত ও সংগঠিত করার ঐকান্তিক লক্ষ্যে মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যগুলো উদ্ভাবিত। ফলতঃ ভক্তেয় ও ভক্তের সম্পর্কে দেবপ্রশস্তি ও মাহাত্ম্য-কীর্তনের মৌল বিবেচনায় মঙ্গল কাব্যের আখ্যানাংশ পরিকল্পিত। কিন্তু দেব দেবীর মাহাত্ম্য-প্রশস্তি এবং ভক্তি-বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ অপেক্ষা প্রাসঙ্গিক সমকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন বিশেষ করে ব্যক্তি চরিত্র তথা ব্যক্তি সত্তার অনপেক্ষ স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের বাস্তব জীবনদৃষ্টি আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্তর্দৃষ্টি ও উপাদানগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। স্মর্তব্য, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল, ফুল্লরা, বেহুলা, ঈশ্বরী পাটুনী, হীরা মালিনী প্রভৃতি চরিত্রের মানবীয় ব্যক্তিতা সমালোচক কর্তৃক বাংলা কাব্য-সমীক্ষায় সম্যক প্রতিষ্ঠিত। এমনকি ধর্মসম্পৃক্ত মানবিক প্রাতিস্বিকতা বিবেচনায় মঙ্গলকাব্যের জীবন সমীক্ষণ অনেকাংশেই আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রায় সমীপবর্তী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনসা মঙ্গলের চাঁদ সদাগরের চরিত্র উল্লেখ্য। সংস্কারবদ্ধ, অসার দৈবী আদেশের প্রতি অবজ্ঞা, পরিণামে সমুদ্রগর্ভে একে একে সসম্পদ পুত্রদের বিনাশ, অবশেষে সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের জীবননাশের অমোঘ দৈবী-বাণী সত্ত্বেও অনমিত চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্ব ও পুরুষোচিত আত্মপ্রত্যয়ের পরাজয়,---আধুনিক বাংলা কাব্যের পুরুষোত্তম নায়ক রাবণের করুণ পরিণতির সঙ্গে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ খুব বিসদৃশ নয়। এ প্রসঙ্গে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের অবস্থা, অবস্থান্তরগত বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য অবশ্যই বিবেচ্য। তদুপরি মধ্যযুগের জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও

বিভিন্ন বর্ণ-ধর্ম-উপধর্মের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্কের মানবীয় সদ্ভাব স্থাপনে মঙ্গল কাব্যগুলোর প্রয়াস মননশীল পাঠক কর্তৃক স্বীকৃত।[১৩] এতদপ্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু কর্তৃক জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের উপযোগী আদর্শ রাষ্ট্র সংস্থাপন স্মর্তব্য। মানবীয় ধর্মানুসারী মুসলিমাধিকারের পূর্বে এ দেশের সাহিত্যে এক প্রকার ব্যক্তিক মূল্যায়ন ও মনুষ্যোচিত সদ্ভাব অভাবিত ছিলো। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে মানবীয় মৈত্রী ও সদ্ভাবের মহত্তম কীর্তি বৈষ্ণব গীতিকা। বাংলা কাব্যের আধুনিক সমালোচক বৈষ্ণব গীতিকার অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব বিবেচনায় সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সঙ্গীত ঈশ্বর-বিষয়ক এবং তত্ত্বাশ্রয়ী। জগত, জীবন, আত্মা ও ঈশ্বর সম্পর্কে একটা পারমার্থিক তত্ত্বান্বেষণ ভাবুক সাধকদের আবহমান কালের সাধনা,—নিত্যদিনের অতিপ্রিয় অনুধ্যান। এ অনুধ্যেয়ী তত্ত্ব আসলে একটা অতীন্দ্রিয় আত্মভাব, একটা ভাবাত্মক অধ্যাত্ম-দর্শন তথা অনির্বচনীয় ব্রহ্মজ্ঞান,—এতদর্থে অপ্রাকৃত ও মনুষ্যাতীত। সন্দেহ নেই, বৈষ্ণব ধর্মও এরূপ একটা তত্ত্বানুসারী। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের অধ্যাত্ম সাধনায় অবিমিশ্র পারমাত্মিক তত্ত্বই সব নয়, বৈষ্ণব গান কেবল বৈকুণ্ঠের তরেই নয়,—এর একটা গভীর ও সুদূরগামী ইহলোকীয় মানব-সম্পর্ক আছে। বরং বলা উচিত, মানব-প্রসঙ্গেই বৈষ্ণব ধর্ম স্থিরীকৃত এবং তার একটা ঐতিহাসিক সম্পর্কও বিদিত। মধ্যযুগে মুসলিম ধর্মের আবির্ভাবে ও প্রভাবে এবং এ-দেশের ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির বৈসাদৃশ্য-বৈসাম্যের এক জটিল প্রেক্ষাপটে একটা একাত্মবাদী তত্ত্বীয় পটভূমিকায় অভিন্ন মানব-সত্য তথা বিশ্বসত্য অবধারণের ঐকান্তিক লক্ষ্যে বৈষ্ণব ধর্ম উদ্ভাবিত।

প্রেম—জাতিধর্ম, দেশ কালের অতীত মানব-হৃদয়ের সর্বোত্তম, সর্বাত্মক ও সর্বকালিক মনুষ্যত্বের মৌলিক অনুভূতি এবং একান্ত প্রিয় সম্পদ। প্রেমের অনন্তত্ব ও সাধারণত্ব প্রশ্নাতীত। মানবলোক ও পারিপার্শ্বিক নিসর্গলোকের প্রতি মানবচিত্তের সম্বন্ধবোধ, মমতাময় আকর্ষণ ও রমণীয় আনন্দানুভব প্রেম-সংবিত্তির সাহজিক সত্ত্বগুণ। মানুষের পরম আরাধ্য এই স্বভাবজ, শাশ্বতিক প্রেমসংবিত্তিই

বৈষ্ণব ধর্মের মূলভিত্তি। এ সার্বভৌম ও অবিনশ্বর মানবীয় প্রেমের বিচিত্র সম্পর্কের একক ও অভিন্ন অনুভবে সমস্ত মানবলোক, জীবজগত ও নিসর্গলোকে সর্বপ্রেমময় পরম পুরুষ তথা পরম সত্যকে উপলব্ধিই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্নিহিত পরম তত্ত্ব।[১৪] বৈষ্ণব ধর্মমতে সমস্ত বিশ্ব-সংসার প্রেমময় পরম ব্রহ্মের প্রেমে বিধৃত। কিন্তু মর্ত্যলোকে এ সর্বময় প্রেমভাবের একচ্ছত্র স্ফূর্ত অধিষ্ঠান মানবচিত্ত। তাই বৈষ্ণব ধর্মে পরমতত্ত্ব অপেক্ষা মানুষ এবং মনুষ্য-প্রেম বিবেচনাই প্রধান। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের রচিত বলে কথিত পদের—'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'[১৫] চরণটির তাৎপর্য স্মর্তব্য। সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, মনুষ্যত্বের প্রেম-সত্ত্ব গুণে অভিন্ন মানব-সত্য প্রতিষ্ঠাই বৈষ্ণব ধর্মের প্রাথমিক ও প্রধান উদ্দেশ্য। জীবাত্মা-পরমাত্মা সম্পর্ক এই মানবীয় প্রেমভাবের চূড়ান্ত ভাবাত্মক পর্যায়ের একটা মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক উপযোজন মাত্র। বৈষ্ণব কবিতা তারই ভাবাত্মক প্রেম সঙ্গীত, তবে চর্যাগীতিকার মত বৈষ্ণব গীতিকায় ভাবাত্মক তত্ত্ব কিম্বা মার্গ বিবেচনাই প্রধান নয়,----প্রধান জীবাত্মা-রূপ মানব-সম্পর্ক, মনুষ্যপ্রেম, মনুষ্যপ্রেমের ব্যাপক ও বিচিত্র অনুভব এবং এ অনুভবে ইন্দ্রিয়জ ভোগাকাঙ্ক্ষা অবাঞ্ছিত নয়। বৈষ্ণব ধর্ম-সঙ্গীতগুলো তাই মানব প্রেম ও ঈশ্বর প্রেমের অতৃপ্ত কামনা বাসনার মিশ্র অনুভূতির কাব্যিক রস মাধুর্যের মর্মস্পর্শী মহিমায় কালোত্তীর্ণ এবং সর্বজন আস্বাদ্য। সরল সরস শব্দ নির্বাচনের অনায়াস প্রবহমানতায়, ভাষা বিন্যাসের বিনম্র কমনীয়তায়, হৃদয় উতল করা নিবেদনের ভঙ্গিতে এবং অনুরাগবদ্ধ বেদনার গীতি-মূর্ছনায় ধর্ম সঙ্গীতগুলো আধুনিক যুগের একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গেই তুলনীয়, পার্থক্য কেবল আধুনিক ভাষা ও শিল্পদৃষ্টির, বিচিত্র ভাব-গৌরব ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের এবং একান্ত ব্যক্তিক অনুভূতির। আধুনিক পাঠকদের মধ্যে সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বৈষ্ণব গীতিকাগুলোর প্রেম ভাবাত্মক অভিন্ন মানব-সত্য তথা বিশ্ব-সত্যের প্রথম মর্মগ্রাহী দ্রষ্টা। বৈষ্ণব গীতিকার প্রেম ভাবাত্মক মানুষিক আদর্শবাদের সমন্বিত ও আত্মনিষ্ঠ গীতিময় কাব্যরূপ বাংলা কবিতার যথার্থ আত্ম-স্বরূপের প্রাথমিক লক্ষণ বৈশিষ্ট্যে তথা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রারম্ভিক গৌরচন্দ্রিকারূপে চির স্মরণার্হ। কারণ, বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দৃষ্টে এ সিদ্ধান্তই প্রবলভাবে প্রতীয়মান

হয় যে, বৈষ্ণব গীতিকার এই জীবাত্মা পরমাত্মা প্রেমই, একান্ত ব্যক্তিক অনুষঙ্গের উন্মুক্ত অনুধ্যানে প্রসারিত হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মত জ্যোতির্ময় মহাদিগন্ত অভিসারী আধুনিক বাংলা কবিতার গৌরবময় ঐশ্বর্যে পর্যবসিত হয়।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের তৃতীয় বিশিষ্ট অবদান রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যান। স্মর্তব্য, মুসলিম সুফী সাধনার নির্জ্ঞেয় তত্ত্বের রূপকাত্মক প্রণয়কাহিনীই মননশীল জীবনরসিক বাঙালী কবির ইহ-জৈবনিক সংসক্তিতে নরনারীর রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যানে রূপান্তরিত। মানব-প্রেম দ্বৈত-স্বভাব-বিশিষ্ট,—ইন্দ্রিয়জ এবং ইন্দ্রিয়াতীত। একটি জাগ্রত ও অর্ন্তমুখী, অপরটি সুপ্ত ও বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়জ প্রেম আদি-ভূত সাহজিক উপজ্ঞা এবং সম্ভোগপ্রবণ। ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম নিষ্কাম, নিঃশ্রেয়স একটা ভাবাত্মক চেতনা। একটি রূপপিয়াসী, ভোগ-বিলাসী ; অপরটি অরূপ লোকে ভাবাবেশী, পরম সত্যান্বেষী। ইতিপূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম সঙ্গীত আলোচনায় প্রেমের এ ভাবাত্মক অনুভূতিতে পরম সত্য অনু-ধ্যানের প্রয়াস ব্যাখ্যাত হয়েছে। সুফী নির্জ্ঞেয় তত্ত্বের রূপকাত্মক প্রণয়কাহিনীগুলোও তাই। কিন্তু বাংলা কাব্যে রূপান্তরিত রোমান্টিক অভিধেয় আখ্যানগুলো নরনারীর পার্থিব প্রণয়ের সৌখিন ও অবাধ কল্পনা-সমৃদ্ধ চিত্তবিনোদনমূলক কাব্য।

মানব-মানবীর রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী পৃথিবীর অতিপ্রাচীন কৌতূহলোদ্দীপক, প্রীতিবোধক, সাহিত্য-সম্পদ। ইতিহাস পূর্বকালের অনেক চিত্তাকর্ষক প্রণয়-কাহিনী কথকতা ও ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত। গ্রীক ও ভারতীয় পুরাণে দেবদেবী কিম্বা দেবত্ব-প্রাপ্ত মনুষ্যের প্রণয়-কাহিনীও বিদিত। মর্ত্যবাসী মানব মানবীর প্রণয়-কাহিনীও খুব বিরল নয়। কিন্তু এসব প্রণয়-কাহিনীই একটা অপার্থিব দেব বা ঐশ্বরিক মহিমায় কিম্বা আধ্যাত্মিক রূপকারোপে স্বর্লোকীয়,—মর্ত্যবাসীর পূজ্য-পাদ স্তোত্ররূপে উচ্চার্য। বাংলা কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাগীতিকা থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব গীতিকা পর্যন্ত ধর্ম, পরম-তত্ত্ব অথবা ঈশ্বর-বিষয়ক প্রবল প্রশস্তিমূলক কাব্য-সাধনার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে রোমান্টিক আখ্যানগুলোতেই একমাত্র ব্যতিক্রান্ত প্রসঙ্গরূপে প্রথম মানুষ তার একান্ত ব্যক্তিক পার্থিব প্রণয়ের সমস্ত আবেগ-সমেত

উপস্থাপিত। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবগীতিকার কাব্যানুরাগ যখন অনেকটা নতুনত্ব-বর্জিত ও স্তিমিত, তখন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর জীবন-ঘনিষ্ঠ হৃদয়-সংবেদের কাব্যিক রূপায়ণ বাংলা কবিতার স্বলোক নির্দেশক, প্রত্যয়ী, উদ্বর্তন মূল্যের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যে লক্ষ্যাভিসারী এবং কৌতূহলোদ্দীপক। কাব্য চর্চার অখণ্ড ও অনিবার্য প্রসঙ্গরূপে জীবনের জাগতিক গুরুত্ব উপলব্ধি, ইহজৈবনিক প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অবলোকন, দেবানুকূল প্রথাবদ্ধ জীবনাচরণে বুদ্ধিবৃত্তি-নির্ভর সাহসিক জীবন-চর্যার উন্মোচন ও আত্মপ্রত্যয়মূলক উদ্যোগ ইত্যাদি মানুষিক গুণাবলীর বিবেচনায় আখ্যানগুলোর মৌলিকত্ব বাংলা কবিতার মুক্তির অবধারিত সম্ভাবনায় দীপ্তিময়। অনন্তর ব্যক্তি জীবনের স্নেহ-প্রেম, আনন্দ–বেদনা, সুখ-দুঃখ এবং জীবনের বীরত্বব্যঞ্জক রোমান্টিক ঘটনাবলীর মত সত্তানিষ্ঠ মানবিক কাহিনীই বাংলা কাব্য-চর্চার প্রভাবিত প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গতঃ রোমান্টিক আখ্যানগুলোর প্রায় অব্যবহিত কালেই রচিত ময়মনসিংহ-গীতিকা জাতীয় লোকজ প্রেমকাহিনীগুলো স্মর্তব্য, বাংলার পল্লীকবি রচিত গ্রামীণ নরনারীর প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, আধুনিক উপন্যাসের দিগ্‌দর্শী জীবনভিত্তিক চমৎকার এই প্রণয়কাহিনীগুলো রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রভাব-প্রসূত সাহসিক প্রয়াসেরই প্রতিফলন।

মধ্যযুগের শেষ দু'শতকে কাব্য-চর্চার এমন সব ব্যতিক্রমী লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ করার অবকাশ নেই, বাংলা কবিতার একটা নিশ্চিত সমাসন্ন মহতী পরিবর্তনের সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত। এ সময়ে, অবশ্য কিছু বিক্ষিপ্ত ধর্মীয় উপাখ্যান রচনার প্রয়াস খুব বিরল নয়। কিন্তু পাঠক সমাজে তার আবেদন ছিলো একান্তই গৌণ।

ইত্যবকাশে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য-চর্চার অপর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে এ যুগের প্রচণ্ডতম প্রশস্তি-মূলক কাব্য-চর্চায় অন্যতম বিষয় হিসেবে না–হলেও, প্রাসঙ্গিক বিষয়-রূপে স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন আর্থ-প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতি কিম্বা শাসক-শ্রেণীর কোন ব্যক্তিবিশেষের সৎকর্মের প্রশংসা এবং অপকর্মের নিন্দা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়কর ভাবেই লক্ষণীয় যে, অপর

কোন জাতি ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের বিপরীত সমাজ-জীবন ব্যবস্থার প্রতি কোনরূপ অশোভন বা অশালীন উক্তি বা বিদ্বেষ প্রচার, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তো নয়ই, এমন কি ভ্রমবশতঃও কাব্য-কথনের বিষয় ছিলো না। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কাব্য-চর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সদ্ভাব-মূলক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসে এ-যুগের কবি-সাধনা ব্যাপৃত ছিলো। অধিকন্তু, প্রকট ধর্মীয় প্রস্তাবনা সত্ত্বেও একটা অবিরুদ্ধ নির্মল কাব্যালোক নির্মাণ-প্রবণতার বৈশিষ্ট্যে এবং অভিন্ন ও একক জাতীয় ঐক্য সংগঠনের মূল্যবোধে এ-যুগের কাব্যসাধনা এক অনন্য মহত্তম কীর্তির গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশে বৃটিশ-পূর্ব যুগের কাব্য সৃষ্টি-প্রাচুর্যে যেমন ব্যাপক ও বিস্তৃত তেমনি গভীর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আধুনিক যুগে তার বিস্তৃত ইতিবৃত্ত বহুল আলোচিত। উপস্থিত নিবন্ধের লক্ষ্য অনুসারে উক্ত আলোচনায় তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য বিধায় সজ্ঞানে বর্জন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রবল ধর্মিষ্ঠ কাব্য-সাধনার প্রারম্ভিক লগ্ন থেকেই বাংলার মাটি ও প্রকৃতির স্বভাব-প্রভাবের অনুদ্দিষ্ট স্বতঃ-স্ফূর্ততায় আভাসপ্রাপ্ত, ব্যতিক্রমী কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট নির্মল বিমুক্ত স্বরূপ-লক্ষণসমূহ প্রতিপাদন এবং বিবর্তনের ধারায় মধ্যযুগের শেষার্দ্ধে সেই মৌলিক লক্ষণসমূহের অভিব্যক্তি বিবেচনার অভিপ্রায়ে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত। এ-পর্যন্ত ইংরেজাধিকারের পূর্ববর্তী কাব্যানুশীলনের যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি ভরতচন্দ্র রায়গুণাকরের অসাধারণ দৃষ্টিক্ষম কাব্য-পারমিতায় সুনির্দিষ্ট ও অনিবার্য নবযুগের লক্ষণে সম্যক পরিস্ফুট এবং তার যথাযথ পর্যবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যায়ের প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; Buddhist Mystic Songs, Renaissance Printers, Dacca, Reprinted, June 1974, Preface—P. XIX

২ সৈয়দ আলী আহসান ; চর্যাগীতিকার তত্ত্বসিদ্ধান্ত, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৌষ ১৩৯১, পৃ. ১-৯

৩ সৈয়দ আলী আহসান ; ঐ, পৃ. ১-৯

৪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ; ঐ, Text-28, P. 78

৫ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ; ঐ, Text–10, P. 30

৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার ; বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৪, কলিকাতা-১৩, পৃ. ৯৭

৭ গোপাল হালদার ; বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা--২, পৃ. ১০--১৩

৮ সুকুমার সেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯৪০, পৃ. ৫১, ৬০

৯ গোপাল হালদার ; ঐ, পৃ. ৩৯

১০ অরবিন্দ পোদ্দার ; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, কলিকাতা--১২, ১৯৫২, পৃ. ৫৪--৫৭

১১ সুকুমার সেন ; ঐ, পৃ. ১২৯, ১৪০

১২ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ; বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দে'জ পাবলিশিং, দে'জ সংস্করণ, মে ১৯৮৩, পৃ. ৫৯-৬৩

১৩ আশুতোষ ভট্টাচার্য ; বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা--১২, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০, পৃ. ১৬৪

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; মনুষ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্ব-ভারতী, ১৯৬৬, পৃ. ৫৭৭

১৫ গোপাল হালদার ; , ঐ পৃ. ১০৫